হযরত আলী (আ.)

মূল : দার রাহে হাক প্রকাশনীর লেখকবৃন্দ

ভাষান্তরে : মোহাম্মাদ আলী মোর্ত্তজা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

এখন আমরা এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের কথা আলোচনা করব, যাকে কবিতার ছোঁয়ায় অঙ্কিত করা যায় না, যায় না তাঁকে মসির আঁচড়ে প্রকৃতরূপে বর্ণনা করাও।

তিনি তো, বর্ণনার চেয়েও উৎকৃষ্ট, কল্পনার চেয়েও সুন্দর, অভিব্যক্তির চেয়েও সমুন্নত। তিনি তো বিস্ময়কর উৎকর্ষে প্রস্ফুটিত, জীবন যাপন করেছিলেন একরূপে, বেঁচে ছিলেন অন্যরূপে, আর বিদায় নিয়েছিলেন উত্তমরূপে। তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি পর্বতসম অটুট মহা মর্যাদাবান, কোমল স্বভাবাধিকারী, নির্মল বারিসম, বিজলীসম কলরবপূর্ণ, সূর্য্যসম তপ্ত, সমুদ্রের মত প্রশস্ত, ঘন শ্যামল অরণ্যের মত বিস্তৃত, বিস্তীর্ণ মরুর মত সরল, ঐশী মালাকুত সম পবিত্র, যেন সকল গুণের সমাহার তাঁর ব্যক্তিত্বে দীপ্তিময়। তিনি তো বিশ্বের বিস্ময়; বিস্ময়কর তাঁর জীবন ব্যবস্থা, আর বিস্ময় ছড়িয়ে দিয়েই তিনি বিদায় নিলেন আমাদের আঁখির আড়ালে।

এখন আমরা সামগ্রিকভাবে তাঁর চরিত্রের ঐ সকল বিস্ময়কর দিক সমূহের আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

জন্ম

ইবনে কা'নাব বলেন : "আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও অন্যান্যদের সাথে কাবা গৃহের সম্মুখে বসেছিলাম। ফাতেমা বিনতে আসাদ আল্লাহর গৃহের নিকটবর্তী হলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এরূপ বললেন : প্রভু হে! তোমাকে, তোমার নবিগণ ও তাদের গ্রন্থসমূহের উপর আস্থা রাখি। স্বীয় পিতামহ ইবরাহীম (আ.)- এর কথা সত্য বলে বিশ্বাস করি, যেমন বিশ্বাস করি যে, তিনি তোমার আদেশে এ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন... তোমাকে তার (হযরত ইবরাহীমের) কসম, আর কসম আমার গর্ভে বিদ্যমান এ শিশুর; তাকে প্রসব করা আমার জন্য সহজ কর।"

এ সময় আমরা আশ্চর্য হয়ে স্বচক্ষে দেখলাম যে, আল্লাহর গৃহের প্রাচীর বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং ঐ মহিয়সী নারী গৃহাভ্যন্তরে পা রাখলেন, অতঃপর পুনরায় প্রাচীর পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল...অনতিবিলম্বে গৃহদ্বার খোলার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু দ্বার খুললো না... অনুধাবন করলাম যে এ কর্মে আল্লাহর হিকমাত বিদ্যমান... চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ সম্মানিতা নারী বাহু যুগলে এক শিশু জড়িয়ে গৃহ থেকে বাইরে এলেন, যে তাঁর জন্য এনেছিল গৌরব... এবং বললেন : অদৃশ্য হতে এক সংবাদ শ্রবণ করলাম যে, তাঁর নাম রাখবে আলী।[১]

আর এ ঘটনাটি **১৩ই** রজব, **৩০শে** 'আ' মূল ফিল' (হিজরতের **২৩** বছর পূর্বে) শুক্রবারে ঘটেছিল।[২]

শৈশবে মহানবী (সা.)- এর আশ্রয়ে

স্বয়ং ইমাম আলী (আ.) তাঁর শৈশব দিনগুলো সম্পর্কে বলেন : "শৈশবে নবী (সা.) আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরতেন, খাবার চিবিয়ে আমার মুখে দিতেন এবং স্বীয় সুগন্ধিতে আমাকে সুগন্ধময় করতেন। তিনি আমার কথায় মিথ্যা, কর্মে ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা কখনো দেখতে পাননি।"

মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)- এর দুগ্ধ পোষ্যকালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরই মহান ফেরেশতাগণকে তাঁর সহচর করেছিলেন, যাতে তাঁকে পৃথিবীর সর্বোত্তম কর্মসমূহের পথে সহযোগিতা করতে পারে। আমিও নবী (সা.)- কে সেরূপে অনুসরণ করতাম যেমন করে কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু তার মাতাকে অনুসরণ করে।

তিনি সর্বদা আমাকে আদেশ করতেন; আর আমি তাঁর সকল কর্মের পদাঙ্ক অনুসরণ করতাম। প্রতি বছর তিনি হেরা পর্বতে যেতেন এবং তখন আমি ব্যতীত তাঁকে আর কেউ দেখতে পেতনা...।

যখন ইসলাম কোন গৃহে প্রবেশ করেনি এবং কেবলমাত্র নবী (সা.) ও তাঁর পত্নী হযরত খাদিজা মুসলমান ছিলেন, আর আমি তৃতীয় মুসলমান ছিলাম, তখন হেদায়েত ও রেসালতের জ্যোতি দেখতে পেতাম এবং নবুওয়াতের সুগন্ধ অনুভব করতাম।[৩]

মহানবী (সা.) তাঁর নবুওয়াত লাভের পর, তিন বছর পর্যন্ত এরূপ কোন আদেশ প্রাপ্ত হননি যে, প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার করবেন। আর তখন হাতে গণা কয়েকজন মাত্র ঈমান এনেছিলেন এবং আলী (আ.) ছিলেন পুরুষদের মধ্যে প্রথম।[৪]

এমতাবস্থায় যখন এ আয়াত নাযিল হয়েছে যে,

(وانذر عشيرتك الاقربين)

'অর্থাৎ আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন' তখন আলী (আ.) মহানবীর আদেশে তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে ৪০ জনকে নিমন্ত্রণ করলেন। এদের মধ্যে আবু লাহাব, আব্বাস এবং হামযার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। একজনের পরিমাণেও যথেষ্ট নয় এ পরিমাণের খাবার তৈরী করা

হল। কিন্তু মহান আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে সকলেই পরিতৃপ্ত হলেন, অথচ ঐ খাবারের কোন ঘাটতি ঘটল না। যেহেতু নবী (সা.) চেয়েছিলেন তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করবেন, আবু লাহাব বলল : 'মুহাম্মাদ তোমাদেরকে যাদু করেছে!' আর তার এ বক্তব্যের ফলেই উপস্থিত সবাই ছত্র ভঙ্গ হয়ে গেল এবং অনুষ্ঠান ব্যর্থ হলো।

সঙ্গত কারণেই মহানবী (সা.) অন্য একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন এবং ভোজন সমাপনান্তে বক্তব্য শুরু করলেন : "হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ! আরব যুবকদের মধ্যে এমন কাউকে আমি চিনি না যে, তোমাদের জন্য আমি যা এনেছি তার চেয়ে উত্তম কোন কিছু তোমাদের জন্য এনেছে। আমি এ বিশ্ব ও অন্য জগতের কল্যাণের সুসংসবাদ এনেছি। আমি মহান আল্লাহর দিকে তোমাদেরকে আহবান করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। অতএব, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমাকে সাহায্য করবে এবং আমার ভাই, আমার ওয়াসী ও উত্তরাধিকারী হবে?"

মহানবী (সা.) এ প্রশ্নটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং প্রতিবারই আলী (আ.) উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন ও স্বীয় প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছিলেন...।

অতঃপর মহানবী (সা.) বললেন : এই হলো আমার ভাই, ওয়াসী ও উত্তরাধিকারী; তার কথা তোমরা শ্রবণ করবে এবং তার আদেশ পালন করবে।[৫]

হিজরতের প্রথম রাত্রিতে আলী (আ.)

ইসলামের প্রকাশ লাভের ফলে কোরাইশদের জন্য মহানবী (সা.) বিপদ জনকরূপে প্রতীয়মান হলেন। কোরাইশদের গোত্রপতিরা 'দারুন্নাদ ওয়াহ' নামক স্থানে মিলিত হলো এবং মহানবী (সা.)- কে হত্যা করার জন্য পরামর্শ সভায় বসল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে নির্বাচিত ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে মহানবীর বাড়ীতে আক্রমণ করে তাঁকে সম্মিলিতভাবে হত্যা করবে।

মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে অবগত হলেন এবং ঐ রাতে স্বীয় স্থানে না ঘুমানোর জন্য ও ঐ রাতেই হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হলেন।[৬]

মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে হযরত আলীকে অবহিত করলেন এবং তাঁকে তাঁর (মহানবীর) শয্যায় এমনভাবে ঘুমানোর নির্দেশ দিলেন, যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে যে তিনি মহানবীর শয্যায় ঘুমিয়েছেন। আলী (আ.) নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রিয় নবী (সা.)- এর জীবন রক্ষা করলেন এবং এ মহান কর্মের জন্য সম্ভাব্য বিপদের ভার নিজ স্কন্ধে ধারণ করলেন। আর এ কর্মটি এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করলেন।

(ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رئوف بالعباد)

'মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে নিজের জীবনকে বাজী রাখে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র' (সূরা বাকারা : ২০৭)।

রাত হলো এবং সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো। হত্যার জন্য আদিষ্টরা মহানবীর গৃহকে চার দিক থেকে পরিবেষ্টন করল... মহানবী (সা.) সূরা ইয়াসীনের একটি আয়াত পড়তে পড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ভিন্ন এক পথে 'সাওর বা সউর পর্বতের গুহার' দিকে দ্রুত ধাবিত হলেন...।

নরহন্তারা উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে মহানবী (সাঃ)- এর শয্যা পাশে উপস্থিত হলো; আলী (আ.) শায়িত অবস্থা থেকে উঠে শয্যার উপর বসলেন। হন্তারা হতচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল : "মুহাম্মদ কোথায়?"

আলী (আ.) জবাবে বললেন : আমি তাঁকে নজরদারী করার জন্য আদিষ্ট ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলাম কি?

তারা আলী (আ.)- কে প্রহার করতে করতে মসজিদুল হারামে নিয়ে গেল এবং সেখানে কিছু সময় আটক রাখার পর মুক্তি দিয়েছিল।[৭]

হযরত আলী মহানবীর আস্থাভাজন ছিলেন

মহানবী (সা.) স্বয়ং কোরাইশদের আস্থাভাজন ছিলেন এবং সকল আমানতসমূহ তাঁর নিকট ছিল নিরাপদ। কিন্তু যখন মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন, তখন তাঁর গোত্র ও গৃহে আলী (আ.) অপেক্ষা বিশ্বস্ত আর কাউকে পাননি। সুতরাং তিনি তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করলেন, যাতে মানুষের আমানত সঠিকরূপে প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে পারেন। আর সেই সাথে ঋণ পরিশোধ করতে পারেন এবং তাঁর (মহানবীর) কন্যা ও নারীগণকে মদীনায় পৌঁছাতে পারেন...।

আলী (আ.), এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মসমূহ সম্পাদনের পর তাঁর মাতা ফাতেমা, মহানবীর কন্যা ফাতেমা এবং যুবাইরের কন্যা ফাতেমা ও অন্যান্যদেরকে নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে মক্কার কাফেরদের মধ্যে আটজনের সাথে দেখা হলো। তারা তাঁরা যাত্রা পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। আলী (আ.) তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করতঃ মদীনার নিকটবর্তী স্থানে যেখানে মহানবী তাঁর জন্য অপেক্ষায় ছিলেন পৌঁছলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন।[৮]

আলী (আ.) ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম

ইসলাম শান্তি ও প্রাণবন্ত ধর্ম। নরহত্যাকে ইসলাম সমর্থন করে না। আর এ জন্যে যে ব্যক্তি অকারণে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করে তার জন্যে ইসলাম অনন্ত শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। তদুপরি ইসলাম, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এক বিশ্বজনীন ধর্ম। সুতরাং সকল মানুষকে এ ধর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আর তাই সকলকে এদিকে আহবান করা এবং এর প্রচারের প্রয়োজন।

স্পষ্টতই প্রথম থেকেই যারা ইসলাম গ্রহণ এবং এর বিস্তৃতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করল, তারা এর বিরোধিতা শুরু করেছিল। আর এখানেই ইসলাম জিহাদের নিয়ম প্রবর্তন ও প্রণয়ন করল, যাতে ইসলামের প্রতি যারা শত্রুতা পোষণ করে তাদেরকে নির্মূল করতে পারে।

অনুরূপ, বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকেও, যেখানে শত্রুরা মুসলমানদের প্রতি আক্রমণ করবে সেখানে আত্মরক্ষা করাটা অপরিহার্য। ফলে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও আত্মরক্ষা করা ইসলামী জিহাদেরই একটি শাখা রূপে পরিগণিত হয়, যার বৈধতা সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তি, ফিতরাত ও ন্যায়চিন্তা স্বীকৃতি প্রদান করে। আর মহানবীর অধিকাংশ যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং হযরত আলী (আ.) অধিকাংশ যুদ্ধেই উপস্থিত থাকতেন, যিনি আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করতেন না। তিনি সমরাঙ্গনে ছিলেন অক্লান্ত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অগ্রপথিক। সিংহসম গর্জন ও ঝড়গতিতে শত্রুপক্ষকে ঘুর্ণিবাতের মত নাস্তানাবুদ ও ধ্বংস করতেন। সমরাঙ্গনে থেকে কখনোই পিছু হটতেন না বলে তাঁর বর্মের পশ্চাদ্বেশ ছিল না। তিনি শত্রুদেরকে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করতেন না। তাঁর তীক্ষ্ণ তরবরির আঘাত নিশ্চিত মৃত্যু বয়ে আনত, একাধিক আঘাতের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁর তরবারী আঘাত হানলে শত্রুর জীবন হরণ ব্যতীত উত্থিত হতো না...।

এখন আমরা তাঁর সমর- জীবনের ইতিহাস থেকে কিছুটা আলোকপাত করব।

খন্দকের যুদ্ধে আলী (আ.)

ইসলামের শত্রুদের একাধিক দল ও গোত্র সম্মিলিত ভাবে মদীনা আক্রমণ করে ইসলামকে নির্মূল করার জন্য সিদ্ধান্ত নিল। মহানবী (সা.) হযরত সালমান ফার্সীর পরামর্শে মদীনার চারিদিকে পরিখা খননের জন্য নির্দেশ দিলেন।

দু'পক্ষের সৈন্যরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। শত্রু সেনাদের মধ্যে আরবদের খ্যাতিমান যোদ্ধা আশি বছর বয়স্ক 'আমর ইবনে আব্দে উদ বীরত্বগাঁথা গেয়ে, ছুটোছুটি করে, ক্রোধান্বিত হয়ে যুদ্ধের জন্য আহবান জানাল।

আলী (আ.) সম্মুখে এগিয়ে গেলেন। আমর বলল : "ফিরে যাও, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না।" আলী (আ.) বললেন : "তুমি তোমার খোদার সাথে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলে যে, কোরাইশের মধ্যে যে কেউ তোমার নিকট দু'টি প্রত্যাশা করবে, তুমি একটিকে গ্রহণ করবে।"

আমর বলল : হ্যাঁ, তোর প্রত্যাশা কী?

আলী (আ.) বললেন : প্রথমতঃ ইসলাম গ্রহণ কর, মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং নবীর উপর ঈমান আন।

আমর বলল : এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই।

আলী (আ.) বললেন : তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও!

আমর বলল : ফিরে যা, তোর পিতার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল, আমি তোকে হত্যা করতে চাই না!

আলী (আ.) বললেন : কিন্তু আমি তো মহান আল্লাহর শপথ করেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সত্য থেকে দূরে থাকবে, তোমাকে হত্যা করতে সচেষ্ট থাকব।

আমর ঘোড়া থেকে নেমে আসল এবং হযরত আলীর উপর তরবারির আঘাত হানল। আলী (আ.) ঢাল তুলে নিলে আমরের তরবারি তাতে আঘাত হানল। ফলে সে আঘাত ব্যর্থ হলো...। অতঃপর

এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করলেন ও হত্যা করলেন। ...অন্যান্যরা এ দৃশ্য দেখে হযরত আলীর নাগাল থেকে পলায়ন করল।[৯]

আলী (আ.) বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে বললেন, "সাবাস আলী! যদি ইসলামের অনুসারীদের সকল কল্যাণ কর্মকে তোমার অদ্যকার যুদ্ধের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তোমার কর্মই সর্বোৎকৃষ্ট হবে। কারণ, এর মাধ্যমে কাফেরদের জন্য অসম্মান ও হতাশা ব্যতীত কিছুই রইল না। অপরদিকে মুসলমানদের জন্য তা বয়ে এনেছে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব।"[১০]

খায়বার যুদ্ধ

মহানবী (সা.) ইহুদীদের ঘাঁটি খায়বারের দিকে গেলেন। এ যুদ্ধে হযরত আলী (আ.) চক্ষুযন্ত্রণার কারণে যুদ্ধে যেতে অপারগ ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকরকে ডেকে পতাকা প্রদান করলেন। হযরত আবু বকর মোহাজিরদের মধ্য থেকে একদল সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেল, কিন্তু দূর্গ জয় না করেই ফিরে আসলেন। পরদিন একই ভাবে হযরত উমরও যুদ্ধ করতে গেলেন এবং বিফল হয়ে ফিরে আসলেন। আর তিনি মুসলমানদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত করলেন এবং মুসলমানরাও তাকে ভীতির কথা শুনাল।

মহানবী (সা.) বললেন : সেনাপতিত্বের জন্য এরা কেউ উপযুক্ত ছিল না, আলীকে আসতে বল!

উত্তরে বলা হলো : তিনি চক্ষু যন্ত্রণায় আক্রান্ত।

মহানবী (সা.) বললেন : তাকে নিয়ে আস। তিনি এমন এক ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ ও তাঁর নবী ভালবাসেন। আর তিনিও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন।

হযরত আলীকে আনা হলো। নবী (সা.) বললেন : আলী তোমার কি অসুবিধা?

আলী (আ.) বললেন : চক্ষু যন্ত্রণা ও মাথা ব্যথা। মহানবী (সা.) তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং স্বীয় মুখের লালা দিয়ে তাঁর চোখ ও মাথায় মালিশ করে দিলেন। ব্যথা দূরীভূত হলো। অতঃপর আলী (আ.)ও শুভ্র পতাকা ধারণ করলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে বললেন : জিবরাইল তোমার সাথে, বিজয় তোমার জন্য অনিবার্য, মহান আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভয় ও ভীতি সঞ্চার করেছেন। জেনে রাখ, তারা তাদের কিতাবে জানতে পেরেছে যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে পরাজিত করবে তার নাম ইলিয়া (আলী)। যখনই তাদের কাছে পৌঁছবে বলবে যে, 'আমার নাম আলী'। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

আলী (আ.) সমরাঙ্গনে গেলেন। প্রথমে ইহুদীদের নেতৃস্থানীয় মারহাবের মুখোমুখি হলেন ও তর্কবিতর্কের পর তাকে তরবারির আঘাতে পরাস্ত করলেন। ইহুদীরা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় নিল এবং দ্বার বন্ধ করে দিল। আলী (আ.) দ্বারের নিকটবর্তী হলেন এবং যে দ্বার বিশজন একত্রে বন্ধ

করেছিল তা এক টানে খুলে ফেললেন। অতঃপর ইহুদীদের দুর্গের পরিখার উপর ছুড়ে ফেললেন যাতে মুসলমানরা তার উপর দিয়ে পার হয়ে দূর্গে পৌঁছতে পারে...। অবশেষে তিনি খায়বার দূর্গ জয় করলেন।[১১]

হযরত আলীর জ্ঞান

ইবনে আব্বাস মহানবীর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন : "আলী আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী এবং বিচারকার্যে সকলের চেয়ে উত্তম।" মহানবী (সা.) বলেন :

انا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد العلم فليقتبسه من عليّ

"আমি জ্ঞানের শহর, আলী তার দ্বার। যে কেউ জ্ঞানার্জন করতে চায় সে যেন আলী থেকেই জ্ঞানার্জন করে।"

ইবনে মাসউদ বলেন : "মহানবী (সা.) আলীকে ডাকলেন এবং তাঁর সাথে একান্তে বসলেন। যখন আলী ফিরে আসলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম কী আলোচনা করছিলেন? তিনি বললেন : মহানবী (সা.) জ্ঞানের সহস্রটি দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করলেন, প্রত্যেকটি দ্বার থেকে আবার সহস্র দ্বার উন্মুক্ত হয়!

একদা হযরত আলী (আ.) মিম্বারে বললেন :

يا معشر النّاس سلوني قبل ان تفقدوني

"হে লোক সকল! আমাকে হারানোর পূর্বেই, আমার কাছে জিজ্ঞাসা কর।"

আমার নিকট থেকে জেনে নাও, কেননা পূর্ববর্তী ও উত্তরবর্তীদের জ্ঞান আমার নিকট বিদ্যমান। আল্লাহর শপথ, যদি বিচারের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়, ইহুদীদের জন্য তাদের কিতাব থেকে, ইঞ্জিলের অনুসারীদের জন্য সে কিতাব থেকে, যবূরের অনুসারীদের জন্য তাদের কিতাব থেকে, আর কোরআনের অনুসারীদের জন্য কোরআন থেকে তবে সেভাবেই বিচার করব... আল্লাহর শপথ, আমি কোরআন ও তার ব্যাখ্যায় সকলের চেয়ে জ্ঞানী।

অতঃপর পুনরায় বললেন :

سلوني قبل ان تفقدوني

আমাকে হারানোর পূর্বেই আমাকে জিজ্ঞাসা কর। কোরআনের যে কোন আয়াত সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তার জবাব দিব; বলতে পারব তার অবতীর্ণ হওয়ার সময় সম্পর্কে, কার

উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, নাসেখ ও মানসূখ সম্পর্কে, আর বলতে পারব সাধারণ ও বিশেষ আয়াত সম্পর্কে, মোহকাম ও মোতাশাবিহ আয়াত সম্পর্কে, মাক্কী ও মাদানী আয়াতসমূহ সম্পর্কে...।[১২]

রাসূল (সা.) হযরত আলীর সকল প্রকৃষ্টতার ভিত্তিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়ার কথাটি মানুষের নিকট ঘোষণা করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং এ কর্ম বিভিন্ন ভাবে তিনি সম্পাদন করেছিলেন। যেমন : গাদীর দিবসে যিনি এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মহানবী (সা.) দশম হিজরী সালে মক্কায় হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ঐ বছর মহানবীর সঙ্গী এক লক্ষ বিশ হাজার বলে বর্ণিত হয়েছে এবং হজ থেকে আসার সময়ও অনুরূপ সংখ্যক মানুষ তাঁর সাথে ছিল। তিনি ১৮ই যিলহজ অর্ধ দিবসের সময় 'জোহফা' প্রান্তরে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে পৌঁছলেন। এ সময় নামাজের জন্য আযান ধ্বনিত হলো। মানুষ একত্র হয়ে নামায সম্পন্ন করল। অতঃপর উটের পিঠের একাধিক গাঁট বাঁধ দিয়ে উঁচু স্থান তৈরী করা হলো। মহানবী (সা.) ঐ উঁচু স্থানে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনান্তে বললেন : তোমরা এবং আমি (মহান আল্লাহর নিকট) দায়বদ্ধ, তাই নয় কি? জবাবে বলা হলো : আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য দীনের প্রচার করেছেন এবং এ পথে আপনি যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন; মহান আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

মহানবী (সা.) বললেন : হে লোকসকল! তোমরা মহান আল্লাহর একত্বে ও তাঁর বান্দা মুহাম্মদের নবুয়্যতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান কর কি? বেহেশত, দোযখ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সত্যতায় বিশ্বাস কর কি? জবাবে তারা বলল : আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি। মহানবী (সা.) বললেন : প্রভু হে, তুমি সাক্ষী থাক।

অতঃপর মানুষের দিকে ফিরে পুনরায় বললেন : হে লোকসকল! আমরা হাউজে কাউসারের নিকট পরস্পরের সাক্ষাৎ পাব। আমার পর আমার দুটি 'মহামূল্যবান সম্পদ' সম্পর্কে তোমারা সাবধান থেকো যে, এতদুভয়ের প্রতি তোমরা কিরূপ আচরণ করছ?

জনতা বলল : হে আল্লাহর রাসূল ঐ দুটি বস্তু কী?

তিনি জবাবে বললেন : ঐ দুটি মহামূল্যবান বস্তু হলো : আল্লাহর কিতাব ও আমার 'আহলে বাইত'। মহান আল্লাহ্ আমাকে অবহিত করেছেন যে, তারা আমার নিকট হাউজে কাউসারে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। ...তাদের অগ্রবর্তী হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হবে, তাদের পশ্চাদবর্তী হয়ো না, তাহলেও ধ্বংস হবে।

এ পর্যায়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীর হস্ত মোবারক সমুন্নত করে ধরলেন যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পায় ও চিনতে পারে এবং ঐ অবস্থায় বললেন :

ايها النّاس ! من أولى النّاس بالمؤمنين من انفسهم ؟

হে মানবসকল! মুমিনদের মধ্যে তাঁর (আলীর) চেয়ে উত্তম কে আছে যে তাদের উপর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পেতে ও নেতৃত্ব দিতে পারে? জনতা বলল : আল্লাহ্ ও তাঁর নবীই ভাল জানেন। নবী (সা.) বললেন : মহান আল্লাহ্ আমার উপর বেলায়েত (কর্তৃত্ব) রাখেন এবং আমি মুমিনদের উপর। আমি মুমিনগণের নিজেদের চেয়ে (তাদের উপর বেলায়েতের জন্য) শ্রেয়তর।[১৩] অতএব,

من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه

"আমি যার মাওলা, এ আলীও তার মাওলা। হে আমার প্রভূ! যে তাঁর বন্ধু হয়, তুমিও তার বন্ধু হও এবং যে তাঁর শত্রু হয়, তুমিও তার শত্রু হও। আর তাকে তুমি সাহায্য কর যে তাঁকে সাহায্য করে; তাকে তুমি শাস্তি দাও যে তাঁর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ...ওহে! প্রত্যেকেই যে এখানে উপস্থিত, সে যেন অনুপস্থিত সকলকে এ সংবাদ পৌঁছে দেয়।

সভাভঙ্গ না হতেই নিম্নলিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হলো :

(اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)

'অদ্য তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম (মায়েদাহ : ৩)।[১৪]

সমান অধিকার

হযরত আলী (আ.) মুসলমানদের শাসনভার হাতে নেয়ার প্রাক্কালে মিম্বরে গেলেন এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করার পর বললেন : আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনার একটি খোরমা গাছও আমার অধিকারে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'বাইতুল মাল' থেকে কিছুই গ্রহণ করব না। চিন্তা করে দেখ যে, যখন আমিই মুসলমানদের বাইতুল মাল থেকে কোন অংশ না নিই, তবে তা কি (অন্যায়ভাবে) তোমাদেরকে দিব?

আকীল উঠে দাঁড়াল এবং বলল : আমাকে মদীনার কৃষ্ণবর্ণদের সাথে এক রকম করে দেখছ?

আমীরুল মুমিনীন বললেন : হে আমার ভাই! বস, তুমি ব্যতীত আর কেউ কি এখানে কথা বলার জন্য ছিল না? ঐ কৃষ্ণ বর্ণের ব্যক্তির উপর ঈমান ও সংযম ব্যতীত তোমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।[১৫]

হযরত আলীর কিছু অনুসারী তাঁর নিকট নিবেদন করেছিল : হে আমীরুল মুমিনীন! প্রথমেই যদি বাইতুল মাল থেকে দলপতিদেরকে সিংহ ভাগ প্রদান করেন তবে আপনার শাসনক্ষমতা সুস্থিত হতো; অতঃপর সর্বস্তরে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করতেন, এটাই কি উত্তম হত না?

ইমাম বললেন : ধিক তোমাদেরকে, যে আমাকে পরামর্শ দিচ্ছ স্বীয় শাসনক্ষমতাকে অন্যায় ও অবিচারের মাধ্যমে মানুষের উপর প্রতিষ্ঠা করতে। না, কখনোই না! আল্লাহর শপথ আমা হতে এহেন কর্ম কখনোই হবে না। আল্লাহর শপথ, মুসলমানদের সম্পদ যদি আমার নিজের জন্যও হতো, তারপরও আমি এক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতাম, তাদের সম্পদের ক্ষেত্রে তো বলারই অপেক্ষা রাখে না।[১৬]

সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা

আলী ইবনে আবি তালিবের শাহাদাতের পর, একদা হামদান গোত্রের সাওদা (আম্মারের কন্যা) নামক এক নারী মুয়াবিয়ার নিকট গিয়েছিল। মুয়াবিয়া সাওদার কঠোর পরিশ্রমের কথা (যা সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী ও তাঁর সৈন্যদের জন্য করেছিল) স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করল ... অতঃপর তার নিকট জানতে চাইল : কি জন্যে এখানে এসেছে? সাওদা জবাবে বলল : হে মুয়াবিয়া! মহান আল্লাহ্ আমাদের অধিকার হরণের জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি সর্বদা আমাদের জন্য এমন শাসক নির্বাচন করছ, যে আমাদেরকে ফসলের মত কর্তন করে, এসপান্দের বীজের মত পদদলিত করে এবং আমাদেরকে হত্যা করে। এখন এই বুসর ইবনে আরতাতকে পাঠিয়েছ, যে আমাদের লোকদেরকে হত্যা করে, আমাদের সম্পদ ছিনেয়ে নেয়; যদি কেন্দ্রীয় শাসনের অনুসরণ না করতে চাইতাম, তবে এখন আমি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী হতাম; যদি ওকে পদচ্যুত কর, তবে তো উত্তম; আর যদি না কর, তবে 'স্বয়ং আমরাই বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান করব...। মুয়াবিয়া অস্বস্থি বোধ করল এবং বলল : আমাকে স্বীয় গোত্রের ভয় দেখাচ্ছ, তোমাকে নিকৃষ্টতম অবস্থায় ঐ বুসরের কাছেই প্রেরণ করব, যাতে তোমার জন্য যা সে উপযুক্ত মনে করবে তাই করে।

সাওদা কিছুক্ষণ নীরব থাকল, যেন তার স্মৃতিপটে অতীতের স্মৃতিগুলো ভেসে উঠল; অতঃপর এ পংক্তিগুলো আবৃতি করল :

প্রভু হে ! তাঁর উপর শান্তি কর বর্ষণ

যে শায়িত আজ কবরে,

যার মৃত্যুর সাথে যুগপৎ

ন্যায় ও আদালতের হয়েছে সমাধি।

সে তো সত্যের দিশারী

সত্যকে কভু করেনি কোন কিছুর বিনিময়ে পরিহার

মুয়াবিয়া জিজ্ঞাসা করল : সে কে?

সাওদা জবাবে বলল : আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)। মনে পড়ে, একদা যাকাত গ্রহণের জন্যে নিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্যে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমি যখন পৌঁছলাম তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু যখনই আমাকে দেখলেন নামায শুরু না করে উদার ও দয়াদ্র কন্ঠে আমাকে বললেন : কিছু বলবে কি? বললাম : জী হ্যাঁ এবং আমার অভিযোগ উপস্থাপন করলাম। ঐ মহান ব্যক্তি স্বীয় নামাযের স্থানে দাঁড়িয়েই ক্রন্দন করলেন এবং মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন : 'প্রভু হে, তুমি জেনে রাখ ও সাক্ষী থাক যে, আমি কখনোই তাকে (আদিষ্ট) তোমার বান্দাদের প্রতি অত্যাচারের নির্দেশ দেইনি। অতঃপর তিনি, অবিলম্বে এক চিলতে চামড়া বের করলেন এবং মহান আল্লাহর নাম ও কোরআনের আয়াত লিখার পর এরূপ লিখেছিলেন :

আমার পত্র পাঠ করার সাথে সাথেই তোমার হিসাব- নিকাশ সম্পন্ন কর, যাতে কাউকে তোমার পরিবর্তে পাঠানোর পর ঐগুলো তোমার নিকট থেকে বুঝে নিতে পারে...।

তিনি পত্রখানা আমাকে দিলেন। আল্লাহর শপথ, ঐ পত্রখানা বন্ধ কিংবা মোহরাংকিতও ছিল না। পত্রখানা ঐ দায়িত্বশীলের নিকট পৌঁছালাম এবং সে পদচ্যুত হল ও আমাদের নিকট থেকে চলে গেল...।'

'মুয়াবিয়া এ কাহিনী শ্রবণান্তে নিরুপায় হয়ে আদেশ দিল, "যা সে চায়, তা- ই তার জন্য লিখে দাও।"

আলী (আ.) ও খলিফাত্রয়

মহানবী (সা.) যখন তাঁর দয়ালু আঁখিযুগল বাহ্যতঃ পৃথিবী থেকে নির্লিপ্ত করলেন এবং যখন তার অস্তিত্বের জ্যোতির্ময় নক্ষত্র মানুষের দৃষ্টিসীমা থেকে অস্তমিত হলো, তখন কিছু কপট 'সাকিফায়ে বনি সায়েদায়' মিলিত হলো এবং মহানবী (সা.) যে হযরত আলীকে মহান আল্লাহর আদেশক্রমে স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছিলেন, তা তারা আবু বকরের (আবু কোহাফার পুত্র) অধিকারে ন্যস্ত করল। তারপর যথাক্রমে ওমর ও ওসমান মোটামুটি একই ধরনের চক্রান্ত ও পরিকল্পনার মাধ্যমে খেলাফতের অধিকারী হয়েছিল। আর এভাবেই অবিরাম ২৫ বছর ধরে তারা নবী (সা.)- এর তিরোধানের পর মানুষের উপর হুকুমত করেছিল। স্বভাবতঃই এ সুদীর্ঘ সময় ব্যাপী অদ্বিতীয় ও সর্বাধিক যোগ্য, ঐশী ও ইসলামী হুকুমতের প্রকৃত নেতা এবং নবী (সা.)- এর উত্তরাধিকারী অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ পথপ্রদর্শক হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ধৈর্য ও স্থৈর্যের আশ্রয় নিলেন ও নিজেকে গৃহবন্দী করে রাখলেন। আর এ ঘটনাটি মানবতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক কাহিনী। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা, এমন কি যাদের কোন দীন নেই তারাও ইসলামের পথে হযরত আলীর অক্লান্ত শ্রম ও প্রচেষ্টা, তাঁর সরলতা, নির্মলতা, বিরত্ব, চিন্তা শক্তি, জ্ঞানের বিস্তৃতি, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের কথা জানলে, ইসলামী সমাজের ভাগ্যে তারা যে অন্যায় ও অত্যাচারের কালিমা লেপন করেছে তার জন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে অনুতাপ ও পরিতাপ করে। তাহলে সুবিচারক মুসলমানদের ক্ষেত্রে কি ঘটবে! এ মর্মান্তিক ঘটনার জন্য আমাদের দুঃখ ও পরিতাপ সুদীর্ঘ পর্বত শ্রেণীর চেয়েও বিস্তৃততর, সুউচ্চ পর্বত চূড়ার চেয়েও উচ্চতর।

যাহোক, আবু বকর দশম হিজরীতে খলিফা হলো এবং ত্রয়োদশ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করল। আর ইতোমধ্যেই তার খেলাফতের দু'বছর, তিন মাস দশ দিন অতিবাহিত হলো।[১৭]

তার পর ওমর ইবনে খাত্তাব খেলাফত লাভ করল এবং জিলহজ মাসের শেষ দিকে তেইশ হিজরীতে 'আবু লুলু ফিরোজের' হাতে নিহত হয়েছিল। তার খেলাফত কাল ছিল দশ বছর ছয় মাস চার দিন।[১৮]

ওমর নিজের পর খলিফা নির্বাচনের জন্য একটি পরিষদ গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল, যা ওসমান ইবনে আফফানের পক্ষে গিয়েছিল। সে ওমরের পর, পরিষদের মাধ্যমে চব্বিশ হিজরীর মহরম মাসের প্রথম দিকে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। অতঃপর পয়ত্রিশ হিজরীর জিলহজ মাসে অন্যায় আচরণের কারণে একদল মুসলমানের হাতে নিহত হয়। তার খেলাফত কাল ছিল বার বছর (কয়েকদিন কম)।[১৯]

মহানবী (সা.)- এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (আ.) স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যারা তাঁর অধিকার পদদলিত করেছিল এবং ইসলামী বিধান যতটুকু অনুমতি দেয়, তার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত যথাসাধ্য প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। একই সাথে বক্তব্য ও দলিলের মাধ্যমে বিষয়টিকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছিলেন এবং মানুষকে অবহিত করেছিলেন যে, এরা হলো খেলাফতের অধিকার হরণকারী। বেহেশতে নারীদের নেত্রী হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.) এ ক্ষেত্রে ইমাম আলীর সহকারী ও সহযোগী ছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রে আবু বকরের হুকুমতকে অবৈধ বলে বর্ণনা করেছেন।

সালমান, আবু যার, মেকদাদ ও আম্মার ইয়াসিরের মত প্রিয় নবীর একদল সম্মানিত সাহাবী আবেগময় বক্তব্যের মাধ্যমে আবু বকরের শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন এবং মহানবীর উত্তরসূরী হিসেবে হযরত আলীর অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছিলেন। তবে হযরত আলী (আ.) ইসলামের কল্যাণার্থে, আর যেহেতু ইসলামের তখনো নব ও বিকাশমান অবস্থা, এবং তখনও ইসলাম যথেষ্ট পরিমাণে সুস্থিত হয়নি, সেহেতু তরবারি হাতে তুলে নেন নি বা সমরাগ্নি জ্বালানো থেকে বিরত থেকেছিলেন। (স্বভাবতই এর ফলে ইসলামেরই ক্ষতি হতো এবং মহানবীর সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারত) বরং অপরিহার্য পরিস্থিতিতে আলী (আ.)

ইসলামের সম্মান অক্ষুন্ন রক্ষার্থে কোন প্রকার দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দিতে কুন্ঠাবোধ করেন নি। আর তাই দ্বিতীয় খলিফা প্রায়ই বলত :

لو لا عليّ لهلك عمر

'যদি আলী না থাকত তবে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।'

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কিংবা অন্য যে কোন সমস্যা যা তাদেরকে হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করত সেক্ষেত্রে হযরত আলীর সুনির্দেশনা ও সদুপদেশ, তাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করত। সকল ক্ষেত্রে তারা প্রায় আলীর দিকনির্দেশনা, মহত্ব ও জ্ঞানের কথা তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এখন আমরা এ ধরনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করব।

হযরত আবু বকরের সময়

ইহুদীদের কিছু আলেম আবু বকরের নিকট এসেছিল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল : আমরা তৌরাতে পড়েছি যে নবীর উত্তরসূরী হবে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি, যদি তুমি এ উম্মতের নবীর উত্তরসূরী হয়ে থাক, তবে আমাদেরকে বল যে, আল্লাহ্ কি আকাশে আছেন, না ভূপৃষ্ঠে?

আবু বকর জবাব দিল : তিনি আকাশে আরশের উপর অধিষ্ঠিত আছেন।

তারা বলল : তাহলে ভূপৃষ্ঠে তিনি নেই। সুতরাং জানা গেল যে, তিনি কোথাও আছেন আবার কোথাও বা নেই।

আবু বকর বলল : এটা কাফেরদের কথা। দূর হও, নতুবা তোমাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিব।

তারা ইসলামকে উপহাস করতে করতে ফিরে যাচ্ছিল। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) তাদের একজনকে ডেকে বললেন : আমি জানি, তোমরা কী জিজ্ঞাসা করেছ এবং কী জবাব পেয়েছ; তবে জেনে রাখ যে ইসলাম বলে : মহান আল্লাহ্ স্বয়ং স্থানের অস্তিত্ব দানকারী, সুতরাং তিনি কোন স্থানে সীমাবদ্ধ নন এবং কোন স্থান তাঁকে ধারণ করতে অক্ষম; কোন প্রকার সংলগ্ন ও স্পর্শ ব্যতীতই তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে...।

ইহুদী পণ্ডিতগণ ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং বললেন : 'আপনিই নবীর উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য, অন্য কেউ নয়।[২০]

হযরত ওমরের সময়

‘কোদামাত ইবনে মাযয়ূন’ নামক একব্যক্তি মদ পান করেছিল। ওমর তার উপর শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করতে চেয়েছিল) অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৮০ টি চাবুক মারতে হবে ।(কোদামা বলল : আমার উপর চাবুক প্রয়োগ করা অপরিহার্য নয়। কারণ, মহান আল্লাহ্ বলেন : যারা ঈমান এনেছে এবং সত্য কর্ম করেছে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়া অবলম্বন ও সৎকর্ম করতে থাকবে, তারা যা ভক্ষণ করে তার জন্য তাদের কোন আশঙ্কা বা ভয় নেই।[২১]

ওমর তাকে শাস্তি প্রযোগ থেকে বিরত থাকল। হযরত আলীর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি ওমরের নিকট গেলেন এবং ওমরের নিকট জানতে চাইলেন, কেন আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করনি? ওমর প্রাগুক্ত আয়াতটি পাঠ করল। ইমাম বললেন : কোদামাহ এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত নয়। কারণ, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও কল্যাণকর্ম সম্পাদন করে, তারা আল্লাহর হারামকে হালাল করে না; কোদামাহকে ফিরিয়ে আন এবং ওকে তওবা করতে বল। যদি তওবা করে তবে তার উপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ কর। নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে। কারণ মদ পানের নিষিদ্ধতাকে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হয়েছে।

কোদামাহ একথা শুনে ফিরে এসে তওবা করল এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকল। কিন্তু ওমর জানতো না যে, তার শাস্তির পরিমাণ কতটুতু হবে। সুতরাং ইমাম আলীর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন : আশিটি চবুক।[২২]

হযরত ওসমানের সময়

আল্লামা মাজলিসি কাশশাফ, ছা'লাবী ও খতিবের 'আরবাইন' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক নারী ওসমানের সময় ছয় মাসে বাচ্চা জন্ম দিয়েছিল। ওসমান ব্যভিচারের হদ জারি করার হুকুম দিল। কারণ, হতে পারে এ বাচ্চা তার স্বামী থেকে নয় এবং সে পূর্বেই কারো মাধ্যমে অন্তঃসত্তা হয়েছিল। তাই তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল।

ইমাম এ ঘটনা শুনে ওসমানকে বললেন : আমি মহান আল্লাহর কিতাব নিয়ে এ ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক করতে চাই। কারণ মহান আল্লাহ্ এক আয়াতে অন্তঃসত্তা থেকে দুগ্ধ পান করানো পর্যন্ত ত্রিশ মাস সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন :

(وحمله و فصاله ثلاثون شهرا)

গর্ভ ধারণ থেকে স্তন্য পান সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত, সময় হলো ত্রিশ মাস। (সূরা আহকাফ : ১৫)। অন্যত্র স্তন্য পানের সময়কাল ২৪ মাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন :

(والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرّضاعة)

'যে স্তন্য কাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে (সূরা বাকারা : ২৩৩)।'

অতএব, যদি নিশ্চিতরূপে চব্বিশ মাস নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে প্রথম আয়াতের মতে যে গর্ভধারণ ও স্তন্য প্রদানের মোট সময় কাল ত্রিশ মাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এতদুভয়ের অন্তর ছয় মাস হয়ে থাকে, যা গর্ভধারণের সর্বনিম্নকাল। অতএব, এ নারী কোরআনের মতে কোন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়নি...।

অতঃপর ওসমানের আদেশে তাকে মুক্তি দেয়া হলো। জ্ঞানীগণ ও আমাদের ফকীহগণ এ দু'আয়াত ব্যবহার করেই গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময় কাল ছয় মাস বলে জানেন। অর্থাৎ স্বীয় বৈধ

পিতার বীর্য থেকে ছয় মাসে বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তা অপেক্ষা কম সময়ে বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করতে পারে না। হযরত আলীর মতও এরকমই ছিল।

হযরত আলীর (আ.)- এর শাহাদাত

চল্লিশ হিজরীতে খারেজীদের একদল মক্কায় মিলিত হলো এবং চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা করেছিল যে, হযরত আলীকে, মুয়াবিয়াকে ও আমর ইবনে আসকে যথাক্রমে কুফা, শাম ও মিশরে নির্দিষ্ট সময়ে হত্যা করবে। পবিত্র রমযান মাসের ১৯ তারিখের রাত্রে হত্যার তারিখ নির্ধারণ করা হলো। এ পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য নির্বাহীও যথাক্রমে এরূপে নির্দিষ্ট করা হলো : আবদুর রহমান (মুলজামের পুত্র) হযরত আলীকে হত্যা করবে, মুয়াবিয়াকে হত্যা করবে হাজ্জাজ (আবদুল্লাহ্ সূরাইমীর পুত্র) এবং আমর আসকে হত্যা করবে আমর (বাকর তামীমীর পুত্র)।

এ উদ্দেশ্যে ইবনে মুলজাম কুফায় আসল। কিন্তু কাউকেই সে তার স্বীয় নোংরা উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেনি। ... একদা একজন খারেজীর গৃহে আশ্রয় নিল। কোতামাহর (সুদর্শনা ও মনোহারীণী রমনী) সাথে সাক্ষাৎ লাভের পর, তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। অতঃপর তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চিন্তা করল। যখন তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল, সে বলল : 'আমার মোহরানা হবে তিন হাজার দেরহাম, এক গোলাম এবং আলী ইবনে আবি তালিবের হত্যা।' কোতামাহ পূর্ব থেকেই নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তার পিতা ও ভাই, হযরত আলীর হাতে নিহত হওয়ার ফলে তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করত এবং চরম প্রতিহিংসায় জ্বলছিল। ইবনে মুলজাম, কোতামাহর কাছে ব্যক্ত করেছিল যে, ঘটনাক্রমে আমি এ কর্ম সম্পাদনের জন্যেই কুফায় এসেছি? আর এভাবেই ইবনে মুলজামের পূর্ব পরিকল্পনা কোতামাহর কামাতুর প্রেমের ছোঁয়ায় দৃঢ়তর হলো।

অবশেষে সে বিষাদ রজনী উপস্থিত হলো ... ইবনে মুলজাম তার দু'একজন একান্ত সহযোগীর সাথে, এ কলুষ চিন্তা মাথায় নিয়ে মসজিদে রাত্রিযাপন করল...।[২৩]

এ বিষাদময় রজনীর ত্রিশ বছরের ও অধিক পূর্বে হযরত আলী (আ.) মহানবীর নিকটে জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি রমযান মাসে শহীদ হবেন। এ ব্যাপারটি হযরত আলীর নিকট শুনবো :...যখন মহানবী (সা.) রমযান মাসের ঐ বিখ্যাত খোতবাটি পাঠ করলেন, আমি উঠে দাঁড়ালাম

ও জানতে চাইলাম : হে আল্লাহর রসূল (সা.)! এ মাসের উৎকৃষ্ট কর্মসমূহ কি কি? তিনি বললেন : পাপাচার থেকে দূরে থাকা। অতঃপর মহানবী (সা.) বেদনাগ্রস্থ হয়ে কাঁদলেন এবং এ মাসে আমার শাহাদাত সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করলেন...।[২৪]

ইমামের কথাবার্তা ও আচার-আচরণেও সুস্পষ্ট ছিল যে, এ মাসে তিনি শাহাদাত বরণ করবেন, একথা তিনি জানতেন। ঐ বছরেই তিনি বলেছিলেন : 'এ বছর হজের সময় আমি তোমাদের মাঝে থাকব না।

অনুরূপ তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো : কেন ইফতারের সময় সল্প খাবার গ্রহণ করেন? তখন তিনি বলতেন : খালি পেটে মহান আল্লাহর সাক্ষাতে যেতে চাই।[২৫]

কিন্তু ঊনিশের রাত্রিতে বি মাত্র নিদ্রা গ্রহণ করেন নি। অধিকাংশ সময় বলতেন : আল্লাহর শপথ, মিথ্যা বলব না ও আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি, 'অদ্যরজনী সে প্রতি ত রজনী।[২৬]

অবশেষে ঐ প্রাতে যখন হযরত আলী (আ.) মসজিদে এলেন। ফজরের নামায পড়া অবস্থায় নিকৃষ্টতম ব্যক্তি ইবনে মুলজামের বিষাক্ত রক্তলোলুপ তরাবারি হযরত আলীর উপর হানা হলো। আর সেই সাথে সত্যের মেহরাবে রঞ্জিত হলো বিভাকর। ... এর দু'দিন পর একুশে রমযানের রাত্রিতে চল্লিশ হিজরী সনে অস্তমিত হলো রঞ্জিত রবি।[২৭]

তাঁর পবিত্র দেহ নাজাফের পবিত্র মাটিতে সমাহিত করা হলো, যা আজ মুসলমানদের বিশেষ করে শিয়াদের দয় মণিতে পরিণত হয়েছে।

ইমাম যেরূপ আজীবন মহান আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে বেঁচে ছিলেন, ঐ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার সময়ও আল্লাহর স্মরণেই ছিলেন। ...যখন ইবনে মুলজামের তরবারি তাঁর দীপ্তিময় মাথায় আঘাত হানল, তখন প্রথম যে কথাটি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা হলো :

فزت وربّ الكعبة

"কাবার প্রভুর শপথ, আমি সফলকাম হলাম।"

অতঃপর তাঁকে রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় গৃহে নিয়ে আসা হলো...। শাহাদাতের শয্যায় দু'দিন পর চির নিদ্রায় চক্ষু মুদন করলেন। ...তিনি প্রতিটি মুহূর্তে তারপরও মানুষের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের

চিন্তায় ছিলেন। ...যদি ও ইমাম হাসান (আ.) এবং তদনুরূপ ইমাম হোসাইন (আ.) ও দ্বাদশ ইমাম পর্যন্ত তাঁর সন্তানগণের ইমামত সম্পর্কে নবী (সা.) ও আলী (আ.) থেকে পূর্বেও একাধিক বার বর্ণিত হয়েছিল, তথাপি কর্তব্য সমাপনার্থে জীবনের অন্তিম লগ্নগুলোতে পুনরায় তা মানুষের জন্য বর্ণনা করলেন...।[২৮]

অন্তিম বাণী

জীবনের শেষ লগ্নগুলোতে সন্তানসন্ততি ও পরিবার- পরিজন এবং মুসলমানদের জন্য এরূপ অসিয়ত করলেন :

“তোমাদেরকে সংযমের দিকে আহবান জানাব এবং তোমরা তোমাদের কর্মগুলোকে বিন্যস্ত কর। সর্বদা মুসলমানদের সংশোধন ও সংস্কারের চিন্তায় থেকো...। অনাথদেরকে বিস্মৃত হয়ো না; প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণ করো। কোরআনকে জীবনের কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ কর।

الله الله في الصّلاة فانّها عمود دينكم

“নামাযকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করো, যা তোমাদের দ্বীনের স্তম্ভ।”

মহান আল্লাহর পথে তোমাদের ধন- সম্পদ, বক্তব্য ও জীবন দিয়ে জিহাদ ও ত্যাগ তিতীক্ষা করো।

পরস্পর মিলেমিশে থেকো ... সৎ কর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মে নিষেধ করা থেকে বিরত থেক না। কেননা, যদি প্রভুর প্রদত্ত এ কর্তব্য পালনে অসচেতন থাক, তবে সমাজে নিকৃষ্টজন তোমাদের উপর শাসন করবে, আর তখন যতই তাদেরকে অভিশম্পাত কর না কেন, তা গৃহিত হবে না।[২৯]

আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক এ মহান পবিত্র ইমামের উপর। আর অব্যাহত থাকুক তাঁর জন্য পবিত্রগণের ও সৎকর্মশীলদের দরূদ, যিনি ছিলেন অসাধারণ। আর তিনি তো বিশ্বের বিস্ময়, বিস্ময়কর তার জীবন ব্যবস্থা, বিস্ময়কর তার বিদায়।

তথ সূত্র

১. বিহারুল আনওয়ার, ৩৫তম খণ্ড, পৃ. ৮।

২. এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ৩।

৩. নাহজুল বালাগা, খোতবা নং ২৩৪- এর কিছু অংশ, পৃ. ৮০২।

৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫। অনুরূপ আল গাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃ.২২০- ২৪০ তে আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ থেকে অনেক রেওয়ায়েত উল্লিখিত আছে।

৫. তারিখে তাবারি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭১- ১১৭৪, এছাড়া মাজমায়ুল বায়ান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ দ্রষ্টব্য।

৬. তাবিখে তাবারি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩২- ১২৩৪।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩২- ১২৩৪।

৮. এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ২২- ২৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩- ৪৫।

১০. বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২০৫।

১১. এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ৫৭- ৫৮

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫- ১৬।

১৩. (النبيُّ اولى بالمؤمنين من انفسهم) সূরা আহযাব : ৬।

১৪. আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯- ১১।

১৫. ওসায়েল, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৭৯।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

১৭. মুরুজুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

২০. ইহতিজাযে তাবরিসি, নতুন সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১২।

২১. সূরা মায়িদাহ : ৯৩।

২২. এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ৯৭ ।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

২৪. উয়ুনু আখবারির রিজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭।

২৫. এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ১৫১।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

২৭. এরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ. ৫; বিহারুল আনওয়ার, ৪২তম খণ্ড, পৃ. ২৮১।

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. নাহজুল বালাগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭, দামেস্ক থেকে প্রকাশিত (লক্ষণীয় যে, এ অসিয়তের মূলবক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে প্রাসঙ্গিকরূপে অনুবাদ করা হয়েছে)।

সূচীপত্র

ভূমিকা 3

জন্ম 4

শৈশবে মহানবী (সা.)- এর আশ্রয়ে 5

হিজরতের প্রথম রাত্রিতে আলী (আ.) 7

হযরত আলী মহানবীর আস্থাভাজন ছিলেন 9

আলী (আ.) ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম 10

খন্দকের যুদ্ধে আলী (আ.) 11

খায়বার যুদ্ধ 13

হযরত আলীর জ্ঞান 15

সমান অধিকার 18

সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা 19

আলী (আ.) ও খলিফাত্রয় 21

হযরত আবু বকরের সময় 24

হযরত ওমরের সময় 25

হযরত ওসমানের সময় 26

হযরত আলীর (আ.)- এর শাহাদাত 28

অন্তিম বাণী 31

তথ্যসূত্র 32